বাংলা পুঁথির হস্তলিপি : উৎস ও বিবর্তন

কল্যাণ কিশোর চট্টোপাধ্যায়

(১)

লিপি: *মানুষ তার মুখের কথা ও মনের ভাবকে স্থান-কালের গণ্ডী পার করে চিরস্থায়ী রূপ দিতে চেষ্টা করেছে বহু সহস্রাব্দ ধরে। তার ফলেই সভ্য সমাজে লিপির সৃষ্টি।*

'মুখের কথা মনের ভাব যাহাতে স্থান কালের গণ্ডী পার হইয়া স্থায়ী রূপ পায় সে চেষ্টা মানুষ বহু সহস্রাব্দ ধরিয়া করিয়া আসিয়া ছিল। তাহার ফলে সভ্য সমাজে লিপির উৎপত্তি।' (ভাষার ইতিবৃত্ত, সুকুমার সেন, ২য় আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২৪)। বস্তুত স্রষ্টা মানুষের ভাব ও বিষয়কে অমরত্ব দিয়েছে লিপি। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতীত থেকে বর্তমানের ধারক ও বাহক লিপি। তাই বিশ্বের বিস্ময় হল লিপির আবিষ্কার। যদি লিপি আবিষ্কার না হত তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাকা ঘুরত না। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা -সংস্কার-ঐতিহ্য-ভাব-কল্পনাকে অমরত্ব দিয়েছে লিপির সাহায্যে।

আগে মানুষের মনে জন্ম নেয় ভাব। আর সেই ভাবকে প্রকাশ করে ভাষা। ভাষাকে চিরকালীন করে তোলে লিপি। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম হল বৈদিক বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। এই বৈদিক বা কথ্য ভাষা সংস্কারের দ্বারা সাহিত্যিক ভাষায় রূপ লাভ করে হল সংস্কৃত। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। ভারতীয় ভাষার ধ্বনি উদ্ভবের একটা অলৌকিক কাহিনি আছে। আধুনিক মন মানতে না চাইলেও, যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অক্ষরগুলি এমন ব্যাকরণ সিদ্ধিলাভ করেছে তা ভাবলে একে অপৌরুষেয় বলে মনে হয়। পাণিনি সনকাদি ভারতীয় বৈয়াকরণ মুনিগণ নিজের তপস্যায় সিদ্ধির জন্য তপোরত দিলেন। নটরাজ শিব তাঁদের উদ্ধারের জন্য নৃত্য শেষে 'নবপঞ্চ' অর্থাৎ ১৪ বার ডমরু বাজিয়ে ছিলেন। তা ১৪টি মহেশ্বর সূত্র নামে খ্যাত। 'মহেশ্বরাদাগতানি নতুন, মহেশ্বর কৃতানি'। 'অই উন' ইত্যাদি ১৪টি সূত্রের সাহায্যে

পাণিনি লৌকিক ও বৈদিক ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ব্যাকরণ হল ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলা ও লেখা শিক্ষার শাস্ত্র। ভাষাকে অমরত্ব দান করার জন্য লিপির আবির্ভাব। ভারতীয় প্রাচীন পুরাণ দেবী তন্ত্রের মাতৃকান্যাসে ৫০টি লিপির উল্লেখ দেখি—'পঞ্চাশ লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃপন্মধ্য বক্ষস্থলাং', সেখানে ১৬টি স্বরলিপি এবং ৩৪টি ব্যঞ্জন লিপির কথা বলা হয়েছে। যথাক্রমে স্বরলিপিগুলি : অ - আ - ই - ঈ - উ - ঊ - ঋ - ঋঋ - ঌ - ঌঌ - এ - ঐ - ও - ঔ - অং - অঃ; ব্যঞ্জনলিপিগুলি : ক - খ - গ - ঘ - ঙ - চ - ছ - জ - ঝ - ঞ - ট - ঠ - ড - ঢ - ণ - ত - থ - দ - ধ - ন - প - ফ - ব - ভ - ম - য - র - ল - ব - শ - ষ - স - হ - ক্ষ।

এছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এবং বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষে লিপি ব্যবহারের কথা জানা যায়। পাণিনির ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায়ে লিপি শব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু এই লিপি কেমন ছিল অর্থাৎ লিপির গঠন কেমন ছিল তা জানা যায় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রামাণ্য লিপি ছাঁদ দু-ধরনের—(১) ব্রাহ্মী লিপি এবং (২) খরোষ্ঠী লিপি।

খরোষ্ঠী লিপি লিখতে হয় ডানদিক থেকে বাঁদিকে। এই লিপি সেমীয় লিপি থেকে জাত। এটি ভারতের নিজস্ব লিপি নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরবি-ফারসি লিপি খরোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন।

ব্রাহ্মী লিপি ভারতের নিজস্ব লিপি। লিখতে হয় বাঁদিক থেকে ডানদিকে। ভারতের মূল আঞ্চলিক লিপিগুলির উদ্ভব হয়েছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে, এই সিদ্ধান্ত ভাষা গবেষকগণের। ব্রাহ্মী লিপির নামকরণেরও একটা শ্রুতি আছে। তা হল জৈনধর্মের আদিদেব ঋষভনাথের কন্যার নাম ছিল ব্রাহ্মী। তিনি খুব বিদুষী ছিলেন। তিনি লিপিচর্চা করতেন। তিনিই প্রথম বাঁদিক থেকে ডানদিকে লিপি চালনা করতে শেখান। সেই থেকে তাঁর নামানুসারে এই লিপি ব্রাহ্মী নামে খ্যাত। কেবল ভারতবর্ষই নয়, এশিয়া মহাদেশের বর্মী-সিংহলী-কম্বোজ -থাই-তিব্বতি প্রভৃতি ভাষার লিপিও এই ব্রাহ্মী থেকেই জাত।

রামায়ণ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কাব্য। ভারতের আদি কাব্যের কবির নাম বাল্মীকি। তাঁর কাব্যের ভাষা সংস্কৃত। সেই রামায়ণ কাব্যের লিখিত রূপে পেয়েছি দেবনাগরী লিপি। এখন প্রশ্ন হল এই দেবনাগরী লিপির রচনা কাল কত? তা জানা গেলে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব তারও অনেক আগে। কারণ ব্রাহ্মী লিপি থেকেই দেবনাগরী লিপির উদ্ভব। তাছাড়া 'ললিত বিস্তারে' বুদ্ধদেব অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী, মাগধী লিপি শিক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু সেখানে দেবনাগরী লিপি শিক্ষার কথা বলা হয়নি। তাহলে কি ধরে নেব, তখনও দেবনাগরী লিপির জন্ম হয়নি? তা কি করে

সম্ভব। কারণ অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় আঞ্চলিক লিপিগুলি দেবনাগরী লিপি থেকেই জাত। যেমন—অ-ব্রাহ্মী লিপিতে   , দেবনাগরী লিপিতে अ , চর্যালিপিতে , কৃষ্ণকীর্তনে   । সুতরাং রথ আগে না ঘোড়া আগের বিতর্ক চলতেই থাকবে।

যে-কোনো দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে অমরত্ব দান করেছে লিপি। যদি লিপি না থাকত তাহলে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আমরা হারাতাম। আর হাজার বছরের ভাব-ভাষা ও সাহিত্যকে ধরে রেখেছে যে লিপি, তার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গেছে —

১। প্রস্তর বা শিলালিপিতে। [ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা অশোকের অনুশাসনগুলি।]

২। তাম্র শাসনে [তাম্রপাতে রাজাদেশাদি]

৩। কাঠ খোদাই লিপিতে [দেব দেউলের কাঠের বিমে খোদাই করা লিপি।]

৪। মন্দিরগাত্রে, সিংহ দরজার উপরে পোড়ামাটির ছাঁচের ফলকে।

৫। তালপাতার পুঁথিতে [চর্যাগীতির পুঁথি]

৬। ভূর্জপত্রে [ভুজ বৃক্ষের সূক্ষ্ম সিল্কের মতো ছাল, কবচাদি লেখা হত বেশি]

৭। তুলোট কাগজের পুঁথিতে [সহস্র সহস্র তুলোট কাগজের পুঁথি পাওয়া গেছে]

৮। বিভিন্ন চিত্রাঙ্কানে বা চিত্রলিপিতে। চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা।

আমরা এখানে বাংলা পুঁথির লিপি উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাসে প্রবেশ করব এবার।

(২)

বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির উদ্ভবের সঠিক সময় জানা যায় না। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি' অধ্যায়ে লিখেছেন—'ললিত বিস্তারে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মগধ লিপি শিখিতে ছিলেন।' এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বঙ্গভাষা ও লিপির জন্ম খ্রিস্টজন্মের কয়েক শতাব্দী আগে। তাছাড়া স্কন্দপুরাণে, দেবীতন্ত্রে ভারতীয় লিপি বিষয়ে যেসব প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষ নিজ অক্ষরমালার জন্য অন্য কোনো দেশের কাছে ঋণী নয়। এই ভাবনার সঙ্গে একমত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডসন্, টমাস প্রমুখেরাও। ভারতের লিপিগুলি ব্রাহ্মীলিপির কুটিল শাখা থেকে দেবনাগরী লিপির মধ্য দিয়ে এক-একটা অঞ্চলে আঞ্চলিক লিপি রূপে জন্ম নিয়েছে। তাই এক-একটা বৃহত্তর অঞ্চলে ভাষা ও লিপিগুলির মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাই আমরা। যেমন—ভারতের পূর্বাঞ্চলের লিপিগুলিতে, বিশেষ করে বাংলা-অসমিয়া- মৈথিল-নেওয়ারী লিপির মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায়। ব্রাহ্মী লিপি প্রথম দিকে সরল ও মাত্রাহীন ছিল। (চিত্র নং-৬)। গুপ্ত আমলে এই লিপির

পরিবর্তন শুরু হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মী লিপি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয় এবং তিনটি বিশেষ রূপ লাভ করে। ক) **উদীচ্য** - উত্তর ভারতের কাশ্মীরি, গুরুমুখী লিপি এই শাখা জাত। একে সারদা লিপিও বলা হয়। খ) **প্রতীচ্য** - গুজরাটি, রাজস্থানি, মারাঠি প্রভৃতি এই লিপি থেকেই জাত। গ) **প্রাচ্য** - প্রাচ্য শাখার লিপির নাম কুটিল লিপি। এই লিপির বর্ণমালা এবং মাত্রা কুটিল বলে একে কুটিল লিপি বলে। ব্রাহ্মীলিপির এই কুটিল শাখা থেকেই বাংলা প্রভৃতি পূর্ব ভারতের মূল আঞ্চলিক লিপিগুলি এবং দক্ষিণ ভারতের প্রধান আঞ্চলিক লিপিগুলিরও জন্ম হয়েছে।

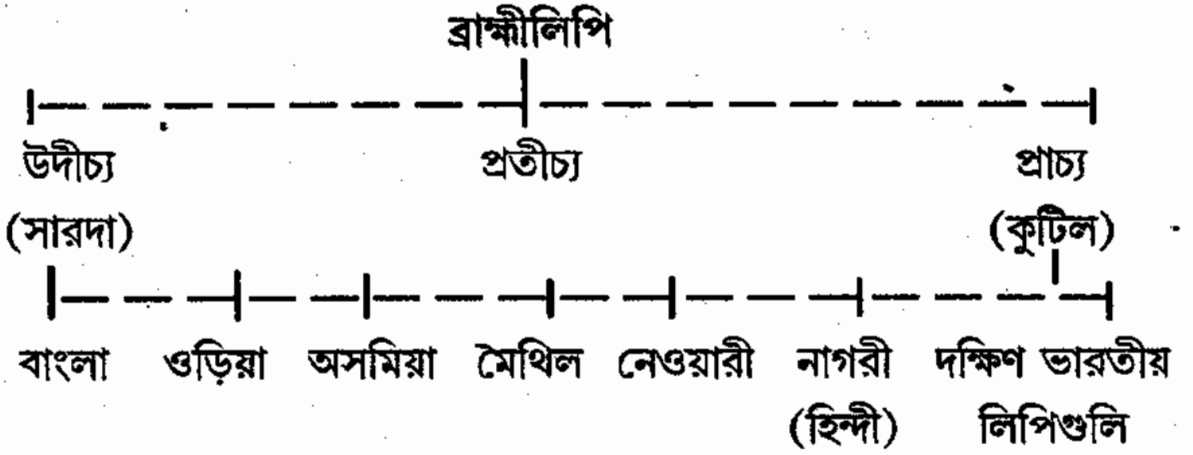

মধ্যযুগের প্রাকৃত সাহিত্য **'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'** বাংলা ভাষার সঙ্গে পবিত্র গঙ্গার তুলনা করা হয়েছে—'অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল বাণীচ'। সুতরাং বাংলা লিপির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

(৩)

এ পর্যন্ত পুথিগতভাবে বাংলা লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন হল পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত নেপালের রাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত তালপাতার (দৈর্ঘ্য/প্রস্থ : ১২.৫/১.৮৫ ইঞ্চি) চর্যাগীতির পুথিটি এবং এই লিপির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে মতভেদ থাকলেও বর্তমানে খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলে পণ্ডিতগণ মোটামুটি একমত। যদিও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি সর্বপ্রথম চর্যাগীতির ভাষাকে প্রত্ন বাংলা বলে প্রমাণ করেছেন, তাঁর মতে চর্যার ভাষার লিপির বয়স খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। কিন্তু পাথুরে প্রমাণহীন ললিত বিস্তারের উল্লেখকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করলে বাংলা লিপির বয়স প্রায় ২২০০ বছরেরও বেশি।

প্রাচীন বাংলা লিপির উদাহরণ রূপে যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর সেগুলি হল : ১। শুশুনিয়া পাহাড়ের (বাঁকুড়া জেলার) রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালেখ (আ : খ্রিস্টীয় ৩য়-৪র্থ শতকের)।

২। কাশীখণ্ড লিপি (১০০৮ খ্রিস্টাব্দের)

৩। চর্যাগীতি (৮ম-১২শ শতাব্দীর)

৪। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বাংলা পুথি (১১৯৮-১২৪০ খ্রিস্টাব্দের)

৫। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে (১২শ-১৩শ শতাব্দীর)

৬। উৎকল রাজ নৃসিংহ দেবের তাম্রশাসন (১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের)

৭। দামোদর রাজের তাম্রশাসন (১২৪৩ খ্রিস্টাব্দের) ইত্যাদি।

চর্যাগীতির পর প্রায় আড়াই শতাধিক বৎসরের অর্থাৎ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত কোনো পুথির সন্ধান পাই না। বলতে গেলে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের আগের কোনো বাংলা পুথির দেখা পাওয়া যায় না। চর্যার পুথিটি দুর্গম নেপাল রাজার গ্রন্থাগারে আত্মগোপন করেছিল। তাও সেটি উদ্ধার হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে—১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-কৃত্তিবাস-মালাধর বসুদের লেখা গ্রন্থ যেগুলি প্রাক্ চৈতন্যযুগের রচনাকাল চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যপর্বের কাছাকাছি সময়ের সেগুলি বাদে তার আগে রচিত কোনো লেখার সন্ধান নেই। তবে কি ওই সময়ের আগে আর কোনো বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়নি? এটা অসম্ভব। নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল। কারণ বাংলার কবি জয়দেবের অমরকাব্য 'গীতগোবিন্দম্' তারও আগে লেখা হয়েছিল, ১২০০ শতাব্দীতে। অথচ তার উত্তরাধিকার থাকবে না ২৫০ বছর ধরে? এটা হতে পারে না। নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এর একমাত্র কারণ তুর্কি আক্রমণোত্তর প্রায় ২৫০ বছর বাংলায় চলছিল মাৎস্যনায় অরাজক অবস্থা। লুটপাট -অগ্নিসংযোগ-রক্তপাতের এক বর্বর অধ্যায়। প্রজা-সাধারণ প্রাণ নিয়ে ছুটোছুটি করছে, তখন সাহিত্য শিল্প সংরক্ষণের প্রতি নজর কোথায়? আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষের শত শত কীর্তিকলাপ, অমূল্য গ্রন্থরাজি। বক্তিয়ারউদ্দীন নালন্দা ধ্বংস করেছিল। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হাজার হাজার পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধগ্রন্থ।

তাই চর্যালিপির পর বাংলা লিপির ক্রম নির্ণয়ের যোগসূত্র ধাক্কা খেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে—বাংলা লিপির উৎস মূলের সঠিক উদ্ধার করা গিয়েছিল বলে। তাছাড়া আমরা যেসব প্রাচীন পুথির নকল লিপি পেয়েছি, সেই সব পুথির মূল রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দী হলেও তার নকল লিপিকাল ১৭শ শতাব্দীর আগে নয়। আমাদের প্রাপ্ত পুথির লিপিকালের প্রাচীনত্ব চারশো বছরেরও প্রাচীন বলতে দ্বিধা হয়। একথাও ঠিক পেশাদার লিপিকরদের অনেকেই ছিলেন বংশপরম্পরায় লিপিকর। এর ফলে পারিবারিক লিপিছাঁদ উত্তরপুরুষেও অবিকল ছিল। তার প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাওয়া লিপি ছাঁদের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। কেবল তাঁরা গ্রন্থ নকলই করেননি, তাঁরা লিপিরও অবিকল নকল করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা তথ্য জানিয়ে রাখি, আমরা পুথিতে যেসব স্বর ও ব্যঞ্জনলিপিগুলির দেখা পাই আধুনিক কালে, সেই সমস্ত লিপির কিছু কিছু বিয়োগ

হয়েছে আবার কিছু কিছু লিপি যুক্ত হয়েছে। যেমন—সমোচ্চারিত লিপিগুলির ক্ষেত্রে (ই/ঈ, উ/ঊ, ন/ণ, য/জ, শ/স/ষ) ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামতো যে-কোনো একটিকে লিপিকর বেছে নিয়েছেন। এজন্য লিপিকরের ব্যাকরণজ্ঞান হীনতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি একথাও ঠিক সেযুগে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ আদৌ ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান থেকেই শুদ্ধ বানান লেখা হত। তাছাড়া মূলত পুথিগুলো লেখা হত আসরে আসরে গান করে হাজার হাজার শ্রোতাদের শোনাবার জন্য, অর্থাৎ গায়েনরা নিজেদের প্রয়োজনে বেশিরভাগ পুথি লেখাতেন। শত শত পাঠক হাতে পুথি নিয়ে তো আর পাঠ করতেন না, তাছাড়া সেযুগে বিদ্যাচর্চা ছিল মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত বা উচ্চকুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ লোক কানে শুনেই তাদের রস পিপাসা মেটাতেন। সুতরাং লিপিকর ইচ্ছামতো ভুল বানান লিখেছেন। পাঠকের পাঠ শুনে উচ্চারণকেই লিপি করেছেন। কানে তো আর বানান ভুল ধরা পড়ে না।

আবার সেযুগের ড়, য়, ঢ়-এর পৃথক ব্যবহার ছিল না। সর্বত্রই ড, য এবং ঢ লিপি করা হত। সংস্কৃত বর্ণ বা লিপিমালায় উপরোক্ত ড়, য়, ঢ় ব্যঞ্জনগুলি নেই। পরবর্তীকালে শব্দের আদিতে ড, য এবং ঢ এবং শব্দের মধ্যে ও অন্তে ড়, য় এবং ঢ়-এর ব্যবহার হতে শুরু করে। যেমন = ডাক - কড়া / তাড়না, যমুনা - সয় / পয়সা, ঢাক - আষাঢ় ইত্যাদি। তাছাড়া সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক পুথিতে য়-এর স্থলে এ, ঞ, অ ব্যবহৃত হত, যেমন = করিঞা, হঅ, হএ ইত্যাদি। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ড়, য়, ঢ়-এর ব্যবহার নেই।

আধুনিককালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিশুমতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য য়, ড়, ঢ় ব্যবহার করতে শেখান। তিনিই পঞ্চানন কর্মকারের নির্মিত কাঠখোদাই হরফে যুক্তাক্ষরে রূপান্তর ঘটান। সেখানে ছিল ঞ্জ, ক্ত, ঙ্ক, জ্ঞা ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর করলেন, ঞ্জ, ক্ত, ঙ্ক, ঙ্গ ইত্যাদি। বাংলা পুথির লিপিতে উপরোক্ত যুক্তাক্ষর লিপিগুলো প্রায় একই রকম লিপিছাঁদে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন = কু = , ঙ্গ - , ঞ্জ - , জ্ঞ - , দ্ধ - , ন্দ - ইত্যাদি। ল, ণ, ন প্রায় একই লিপিছাঁদ ।

লিপির গঠন প্রকৃতির দিক থেকে সাদা চোখে যা ধরা পড়ে তা হল —

১। হস্তলিপির কোনো নির্দিষ্ট মাপ নেই।

২। লিপির কোনো নির্দিষ্ট ছাঁদ নেই, ছাপা লিপির মতো।

৩। লিপির বানানের ক্ষেত্রে একই পুথিতে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান আমাদের বিভ্রান্ত করে। এর থেকে বোঝা যায় সঠিক বানান বিধি সে-যুগে ছিল না।

৪। লিপি অনেক সময় জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে, পৃথক ও স্পষ্ট থাকেনি।

৫। লিপি নির্মাণে লিপির উপাদান যেমন—কাগজ, কালি, লেখনী এবং লিপিকরের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(৪)

এবারে আমরা লিপির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলি এবং যিনি পুথি লিপি করেন অর্থাৎ লিপিকরের ভূমিকা ও অবদান আলোচনা করব। পুথির তিনটি অন্তরঙ্গ উপকরণ হল

১। **কাগজ বা লেখপত্র**—লেখপত্র বা লিপিপত্র রূপে দেখতে পাই - (ক) **তালপাতা** এবং (খ) **তুলোট কাগজ**।

(ক) তালপাতায় লেখা সাহিত্য বিষয়ের পুথি রূপে একমাত্র চর্যাগীতির পুথিটি পাই। বেশিরভাগ তালপাতায় লেখা পুথিগুলি হল গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়ের গ্রন্থ। তালপাতায় লেখা বাংলা সাহিত্যের পুথি নেই বললেই চলে। তালপাতা যদি মসৃণ হয় তাহলে তাতে লিপি করা সহজ হয় এবং লিপিছাঁদ ভালো হয়।

(খ) তুলোট কাগজের পুথিই আমরা সমস্ত পুথিশালাতে দেখতে পাই। এই তুলোট কাগজগুলোতে দু-ভাঁজ করে উপরে মসৃণ দিকে লিপি করা হয়। এই তুলোট কাগজ ছিল হস্তনির্মিত (আগ্রহী পাঠক মৎ-প্রণীত 'বাংলা পুথির গঠন ও প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে পুথির উপাদানের বিস্তৃত আলোচনা করা আছে, দেখে নিতে পারেন)। কাগজ নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোনো নির্দিষ্ট মাপ ছিল না। তাই ভিন্ন ভিন্ন মাপের ভিন্ন ভিন্ন পুথি আমরা দেখতে পাই। এই পত্রগুলি এমনভাবে তৈরি হত যে এগুলো দীর্ঘজীবী হয়েছে। তুলোর পরিমাণ বেশি থাকায় এগুলো সিল্কের কাপড়ের মতো নমনীয় এবং সংকোচন-প্রসারণশীল। এছাড়া পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই কাগজে হলুদ, অভ্র, তুঁতে পরিমাণ মতো মেশানো হত। উপাদানের মধ্যেই ছিল কাগজের দীর্ঘজীবী হওয়ার রহস্য। পাতা যত মসৃণ হয় লিপি করার ক্ষেত্রে লেখনী চালনা তত সহজ হয়। সুতরাং লিপির ক্ষেত্রে লিপিপত্রের আনুকূল্য প্রয়োজন।

এছাড়া কবচ তাবিজ লেখার জন্য ভুর্জপত্রের (ভুজ গাছের সিল্কের কাপড়ের মতো অতি সূক্ষ্ম ছাল) ব্যবহার ছিল।

২। **কালি**—কালিও লিপির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কালো এবং লাল দুই বর্ণের কালি পুথিতে ব্যবহৃত হতে দেখি। কালি নির্মাণের অনেক ছড়া আছে। যেভাবে কালি প্রস্তুত করা হত তার উপাদানের মধ্যেই আছে কালির দীর্ঘজীবী হওয়ার রহস্য। কালি নির্মাণ আলো চাল পুড়িয়ে তাকে জলে গুলে তার কষের সঙ্গে লোধফুল, আকন্দফুল গাছের কাঠ-কয়লা তাতে ঘষা হত, তার সঙ্গে লোহা ঘষে মেশানো হত এবং বাবলা গাছের আঠা এবং ডালিম ফলের খোসা ভেজানো কালো কষ মিশিয়ে

কালি নির্মাণ করা হত। আর তার সঙ্গে ছাগলের দুধ পরিমাণ মতো মেশানো হলে সেই কালি—'তোটে পত্র না তোটে মসী'।

কালি প্রস্তুতির ছড়া-১/ লোধ লোহা লোহার গুঁড়ি অর্কাঙ্গার জবার কুঁড়ি।
বাবলা ছাল জাঁটির রস ডালিম ছেঁচে করিবে কষ।
ভেলায় কর এক আলি চারি যুগনা উঠবে কালি।
২/ ত্রিফলা শিমূল ছালা ছাগ দুগ্ধে দিয়ে তোলা।
লোহা দিয়ে লাহাই ঘষি মসী বলে আকাট বসি।

কুমকুম গুলে লাল কালি করা হত। সাধারণত অধ্যায় শেষে, কবি ভণিতার পরে পুষ্পচিহ্ন লাল কালিতে এঁকে বিশিষ্ট করা হত। পুথিতে চিত্র অঙ্কনেও লাল কালি ব্যবহৃত হত। কালির ঘনত্ব ঠিকমতো থাকলে একবার লেখনী ডুবিয়ে অনেকগুলো শব্দ লেখা যেত। এতে লিপিকরের লেখায় উৎসাহ বৃদ্ধি পেত।

৩। **লেখনী**—যা দিয়ে লিপি করা হয় তাকে লেখনী বলে। সাধারণত পাখির পালক, শর, খাগ, কঞ্চির সূচালো অগ্রভাগ দিয়ে লিপি করা হত। পশুর লোম দিয়ে নির্মাণ করা হত তুলি। এই তুলি সাধারণত অঙ্কনের কাজে ব্যবহার করা হত। লেখনীর লিপিমুখ যদি লেখার অনুকূল না হয় এবং লেখনীর যদি কালি ধারণের ক্ষমতা কম হয়, সেক্ষেত্রে লেখার কাজে বাধা পড়ে। তাই লেখনীর ভালোমন্দ লিপির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪। **লিপিকর**—পুথির যিনি লিপি করেন তাঁকে লিপিকর বলে। স্বয়ং কবি স্বহস্তে লিপি করতে পারেন, অথবা তিনি লিপি অপারগ হলে অন্য কাউকে দিয়ে বা পেশাদার লিপিকরকে দিয়ে লিপি করিয়ে থাকেন। অবশ্য বেশিরভাগ পুথিই নকল পুথি, পুথি দেখে কিংবা পাঠকের পাঠ শুনে লিপিকর লিপি করেছেন। পুথির লিপিতে তাই লিপিকরের গুরুত্ব ও অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই লিপির প্রাণপুরুষ। লিপিকর কেমন হবেন—'গড়ুর পুরাণে' তার সুন্দর বর্ণনা আছে। তিনি হবেন—

(১) মেধাবী (২) বাকপটু (৩) ধীর (৪) লঘুহস্ত (৫) জিতেন্দ্রিয় (৬) পরশাস্ত্র পারঙ্গম (৭) সর্বদেশাক্ষর সম্পন্ন (৮) সর্ব ভাষাবিশারদ (৯) সর্বাধিকরণ। (গড়ুর পুরাণ-১১১/৭।

তিনি কেমন লিপি করবেন—

'সমানি সম শীর্ষাণি বর্তুলানি ঘনানি বিরলানি চ।
মাত্রাসু প্রতি বর্দ্ধানি যো জানাতি স : লেখক : ।।' (মৎস্য পুরাণ)

লিপি হবে —

১। পৃথক ২। স্পষ্ট ৩। গোলাকার ৪। গায়ে গায়ে লেগে যাবে না। (ঐ)

সেখানে আরও বলা আছে —

১। লিপি করতে অক্ষম কবির সাক্ষাতে লিপিকর লিপি করবেন।

২। তাঁর অনুমতিতে,অথবা —

৩। গ্রন্থ মালিকের অনুমতি নিয়ে লিপিকর পুথি নকল করবেন।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, কবি বা পুথির মালিকের অনুমতি চাই পুথি লিপি করতে। লিপিকর তিন ধরনের। ১/ স্বয়ং কবি পুথিলিপি করেছেন। ২/ পেশাদার লিপিকর, লিপি করার বিনিময়ে তিনি টাকা-বস্ত্র-ধান ইত্যাদি পেতেন। ৩/ এছাড়া আর একধরনের লিপিকর ছিলেন যাঁরা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পুথি লিপি করতেন।

(ক) সাধারণত লিপিকর লিপি করতেন—১/ পাঠকের পাঠ শুনে শুনে, ২/ দেখে। পুষ্পিকায় লিপিকরগণ লিখেছেন 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তি'। কিংবা পুষ্পিকায় লিপিকর পাঠকের নাম লিখে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় লিপিকর পাঠকের পাঠ শুনে পাঠ লিপি করেছেন। তাই এমন অনেক পুথি দেখতে পাই যেখানে লিপিকর পাঠকের উচ্চারণকেই লিপি করেছেন—'যমুনার জলে' হয়েছে 'যমুনারও জলে'।

(খ) অঞ্চল ভেদে লিপিকরদের নানা ঘরানার লিপিছাঁদের দর্শন মেলে। এরফলে একই সময়ের একই বিষয়ের পুথি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ঘরানার লিপিকরের হাতে লিপির ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদ দেখতে পাই। ভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি একই বিষয়ের এবং একই সময়ের পুথি পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই তা সহজে বোঝা যাবে।

(গ) আবার লিপিছাঁদ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে লিপি অর্বাচীন কালের, অথচ লিপিকাল মূল লিপিকালের। এখানে লিপিকর মূল পুথি দেখে নকল করতে গিয়ে মূল গ্রন্থের লিপিকাল লিপি করেছেন। এরফলে অনেক সময় লিপিকাল নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়।

(ঘ) আবার উলটোটাও ঘটে। লিপিকাল অর্বাচীন কিন্তু লিপিছাঁদ প্রাচীন। এখানে লিপি শিল্পী মূল লিপি ছাঁদটিকে অবিকল নকল করে দিয়েছেন।

(ঙ) আবার একই পুথিতে একাধিক হস্তলিপি বা একাধিক লিপিছাঁদ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অনুমান—

(১) একাধিক লিপিকর লিপি করেছেন।

(২) একই লিপিকর কখনো ধরে ধরে, লঘুহস্তে লিপি করেছেন; কখনো দ্রুতহস্তে লিপি করেছেন; কখনো মনোযোগ দিয়ে; কখনো অমনোযোগ; কখনো লেখনীর অসহযোগিতা; কখনো লিপিপত্রের অমসৃণতার বাধা; কখনো এমন হয়েছে যে, শেষ পত্রটিতে দু-একটি অধিক চরণ লিপি করতে হবে,

তখন লিপিকর লিপিছাঁদের পরিবর্তন করতে চেয়েছেন একটি মূল্যবান পৃষ্ঠা বাঁচাতে, —ফলে লিপিছাঁদে পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া আমাদের হাতের লেখা সর্বদা একই রকম থাকে না।

(চ) অনেক সময় লিপিকর পাঠকের পাঠ বা অর্থ ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেন নি, শ্রবণত্রুটিতে; কিংবা, পাঠকের উচ্চারণ ত্রুটিজনিত কারণে, ফলে লিপি বিভ্রাট ঘটেছে। 'পার্বতী সুত লম্বোদর' শ্রুতিপাঠ হয়েছে 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর'। পাঠকের উচ্চারণে 'শ্রীনিবাস' হয়েছে 'চিনিবাস'। এ লিপিকর প্রমাদ নাকি পাঠকের পাঠ প্রমাদের ফল তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

(ছ) অনেক সময় দেখে দেখে পুথির লিপি করতে গিয়ে লিপিকর লিপি বুঝতে না পেরে ভুল লিপি করেছেন। 'ইন্দ্রের' স্থলে 'ইছের' লিপি করেছেন (দ্রষ্টব্য, 'মধ্যযুগের কাব্য পাঠ' অধ্যাপক নির্মল দাশ)। আসলে, 'ছ' এবং 'ন্দ্র' অনেকটা একই রকম লিপি হত।

(জ) লিপির হরফে-কোনাকার ও বৃত্তাকার দু-ধরনের লিপিছাঁদ দেখি। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এ এই দু-ধরনের লিপিছাঁদ দেখা যায়।

(ঝ) বাংলা লিপি কুটিল লিপি। দক্ষিণ ভারতের লিপিগুলিও কুটিল লিপি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু, বাংলা লিপি তুলোট কাগজে খাগ বা কঞ্চির লেখনীতে লেখা বলে বাংলা লিপি কোনাকার। আর দক্ষিণ ভারতের লিপি লৌহ শলাকা দিয়ে কাঁচা তালপাতায় লেখা হত বলে গোলাকার লিপি। বাংলায় 'ক', ওড়িয়াতে , শ্রীলংকার , মালয়ালম্ , কন্নড় ।

(ঞ) লিপিকরের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, রুচি লিপিতে প্রভাব ফেলে। কেউ ধীরে লেখেন, কেউ টানা টানা লিখতে ভালোবাসেন—লিপিকরের ব্যক্তিগত প্রবণতা লিপিতে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কেউ সোজাভাবে লিপি করেন, কেউ বাঁকাভাবে লিপি করতে ভালোবাসেন। লেখনী ধরার ক্ষেত্রেও লিপিকরে লিপিকরে ভিন্নতা—লিপিছাঁদে প্রভাব ফেলে।

(ট) লিপিকর পুষ্পিকা-য় গ্রন্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুথিতে সন্নিবেশিত করেন। সেগুলি হল—

(১) কাব্যের নাম (২) কবির নাম (৩) লিপিকর (নিজের নাম) পরিচিতি (৪) পাঠক পরিচিতি (৫) প্রযোজকের নাম অর্থাৎ পুথির মালিকের নাম, ধাম (৬) কোথায় বসে পুথি লেখা হল (৭) পুথি লেখার উদ্দেশ্য (৮) লিপিকাল (মূল/নকল লিপিকাল) (৯) তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা ইত্যাদি।

এখানে দুটি পুষ্পিকা উদ্ধার করা হল :— (পুথি:-চৈতন্য চরিতামৃত, কবি, কৃষ্ণদাস, বিশ্বভারতী পুথি—১২২৪)

I) 'ইতি শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত ।। ০।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক নাস্তি দোষক। ভিমাদী রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ০।। ভিম আদি করিয়া জে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্যক মতিভ্রম মহামুনিগণে।। জদি বাটী বাড়ি হয় না লবে অপরাধ। দোস ক্ষমা করি সভে করিবে আসির্বাদ।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাঁই। গবা গুণা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই ।। ০।। ইতি লিখিতং শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্ম্মনস্য সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হৈল।। শ্রীশ্রী মঙ্গল চণ্ডীকায়ৈ নম : সাং খণ্ড ঘোষ। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবিষ্টি হইল সস্বি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ ইইয়াছিল আর কোথাও ২ জলাভূমে হইল টাকায় ১২ বার সের চালু তৈল আড়াই সের লবণ তের সের কলাই এগার সের তরিতরকারী নাস্তী, সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ত্ত (সত্তর) বৎসরের মুন্বীসী বলেন আমরা কখন এমন যুনিনাই ইহাতে কত ২ মুন্বিসী মরিল বড় ২ লোকের হাড়ী চাপে নাই সাঙ সন ১১৭৭ সালের মাহভাদ্রতক মহাপ্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়। ১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারি সত্ত তিরিশ লেচাড়ি সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল আনেক মনিস্বী নষ্ট হইল মহা মন্বন্তর।'

লিপিকরের লেখা এই পুষ্পিকাটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য —

১। এখানে পুথির নাম পেলাম 'শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকা'।

২। লিপিকরের নাম নন্দদুলাল দেবশর্মা (ব্রাহ্মণ)।

৩। লিপিস্থান খণ্ডঘোষ, বর্ধমান জেলার একটি ছোটো জনপদ।

৪। লিপিকাল ১১৭৭ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ৮ম প্রহরে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

৫। ১১৭৬ সালে বাংলাদেশে যে ভয়ঙ্কর মহা মন্বন্তর হয়েছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অছে। এটি একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল।

৬। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগে বাংলা গদ্যের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পথ- প্রদর্শক এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৭। লিপিকর একই শব্দের বানান সর্বত্র একই রাখেন নি। যেমন—'মনিস্বী'-'মুন্বিসী' ইত্যাদি। এতে অনুমিত হয়, লিপিকরের বানান সম্পর্কে স্বচ্ছ বোধ ছিল না।

II) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সংখ্যা ২১৬, পুথি — রাগ পঞ্চঅধ্যায় / রাগ পঞ্চঅঙ্ক। কবি — জগন্নাথ দাস। লিপিকর শ্যামাচরণ দাস ঘোষ। 'ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে। দসম স্বন্দে রাস উচ্ছবে গোপিকা পন্থকানাম চৌউতিস

অধ্যায়।। যথা দিষ্টং স্তথা লিখিতং লিখিকো নাস্তি দোসকং ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং ইতি সন ১১১৮ — রোজ যুক্র এক প্রহর মাহ পোষ — পর্গনে মেদনিপুর মোকাম মথুরার ঘাট লিক্ষতে সামাচরন দাস ঘোষ।। রাষ পঞ্চঅধ্যায় পুস্তক সমাপ্তং এ পুস্তক শ্রী গোকুলানন্দ দাস তন্তুবায়।। *।। *।।'

এই পুষ্পিকাতে লিপিকর জানিয়েছেন —

১. পুথির নাম ২। লিপিকাল ৩। নিজের নাম ৪। গ্রন্থ মালিকের নাম ইত্যাদি।

(ড) লিপিকর যদি লিপিকাল না দেন বা পুষ্পিকা না থাকে অর্থাৎ লিপিকাল জানা না গেলে—সম্ভাব্য লিপিকাল নির্ণয় করা যেতে পারে এভাবে —

১) কালি ও কাগজ পরীক্ষা করে,

২) একই লিপিকরের লিপিকাল দেওয়া অন্য কোনো পুথির লিপিকাল দেখে,

৩) লিপিছাঁদ ও লিপির ভাষা বিচার করে,

৪) যদি লিপিকর মূল গ্রন্থ লিপিকালটি দিয়ে দেন তাহলে সমস্যা গুরুতর। সেক্ষেত্রে লিপিছাঁদ, ভাষা, ছন্দাদির বিচার করে আসল না নকল পুথি তা বোঝা যায়। বানান ভুল কম, মিশ্র পাঠ না থাকা, সঠিক ছন্দ ইত্যাদি আসল না নকল পুথি চিনিয়ে দেয়।

(ঢ) লিপিছাঁদে আঞ্চলিক প্রভাবও লিপির গঠন ও প্রকৃতিতে প্রভাব ফেলে।

(ণ) মিশ্র পাঠ, প্রক্ষিপ্ত পাঠ, পাঠ সমস্যা, অক্ষর ও শব্দ বিভ্রান্তি, বর্ণ বিপর্যয় বা স্থানচ্যুতি, চরণ বিপর্যয়, বর্জন বা লিপিচ্যুতি, সংযোজন ইত্যাদির জন্য লিপিকর তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না (মৎ-প্রণীত বাংলা পুথির গঠন ও প্রকৃতি', প্রজ্ঞাবিকাশ, কোলকাতা ৭৩, গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।) লিপিকরের দায়িত্বের মধ্যে এটাও পড়ে যে তিনি লিপিশেষে আদর্শ পুথি বা যে পুথিটি দেখে তিনি লিপি নকল করেছেন তার পাঠ একাধিকবার মিলিয়ে নেবেন। অনেকে এটা করতেন, তার প্রমাণ পুথিতে অজস্র সংশোধনী তোলা পাঠের উল্লেখ আছে। তা সত্ত্বেও ভুল থেকে গেছে বিস্তর। সমস্যাও আছে বিস্তর।

(ত) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশিত 'বাংলা পুথি' (১ম-৪র্থ খণ্ড)-র বর্ণনামূলক তালিকায় তিন শতাধিক পুথির উপর সমীক্ষা করে আমরা ১৪০ জন লিপিকরের নাম পরিচয় পেয়েছি। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ শ্রেণির যেমন আছেন তেমনি ব্রাহ্মণেতর শ্রেণির প্রতিনিধিও আছেন, এঁদের সংখ্যাই বেশি — শতকরা ৭০ ভাগ। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পেশাদার লিপিকর আছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়; এঁদের নামে একাধিক পুথির লিপির পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন — অনন্ত নন্দী (২) ৩, ২০ সংখ্যক পুথি, গুরুদাস দত্ত (৫) ৬,১১,১৭৬,

১৯৭,১৯৯। শ্রীনিবাস দে (চিনিবাস দে) গন্ধবণিক (৫) ১১৮,১২৪,১২৮,১৫২, ১৭৯। হরিদাস বৈরাগি (৫) ১৬,৪৭,৬৮,১৩৫,১৯৮। গঙ্গাহরি দাস (২) ৩৩, ৩৭। আনন্দ পালিত (২) ৮১,১০৭। এছাড়া ব্রাহ্মণেতর যাঁরা পুথি লিপি করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে তুলে ধরা হল (পাশে পুথি সংখ্যা উল্লেখ করা হল) — রাঘবেন্দ্র দাস ১৪ নং, ক্ষেত্রমোহন কুম্ভকার ১৪৪ নং, গঙ্গারাম কর্মকার ২০০ নং, বিজয়রাম মাল ৫২ নং, মাধব পাল ৯২ নং, ধনঞ্জয় মোদক ৭ নং, কার্তিকচন্দ্র মাল ৭২ নং ইত্যাদি। এঁরা পেশাদার লিপিকর।

পরিশেষে, এখানে কয়েকটি লিপির চিত্রমালা সংযোজিত করে ব্রাহ্মীলিপি থেকে আধুনিক বাংলা লিপির বিবর্তনের ক্রম তুলে ধরা হল এবং চর্যাদি কয়েকটি পুথির একটি করে পাতার ফটো কপি সন্নিবেশিত করা হল—এর ফলে ১. লিপি-পরিচয় ২. পুথির চরণ বিন্যাস ৩. গ্রন্থছিদ্র ৪. লিখন রীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে। এর দ্বারা আগ্রহী পাঠকের যদি পুথির লিপিজ্ঞানে সহায়তা হয় তাহলে পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

অশোক শিলালিপি (ব্রাহ্মী লিপি, রুম্মিনদেই পিলার ইনস্ক্রিপশান)—

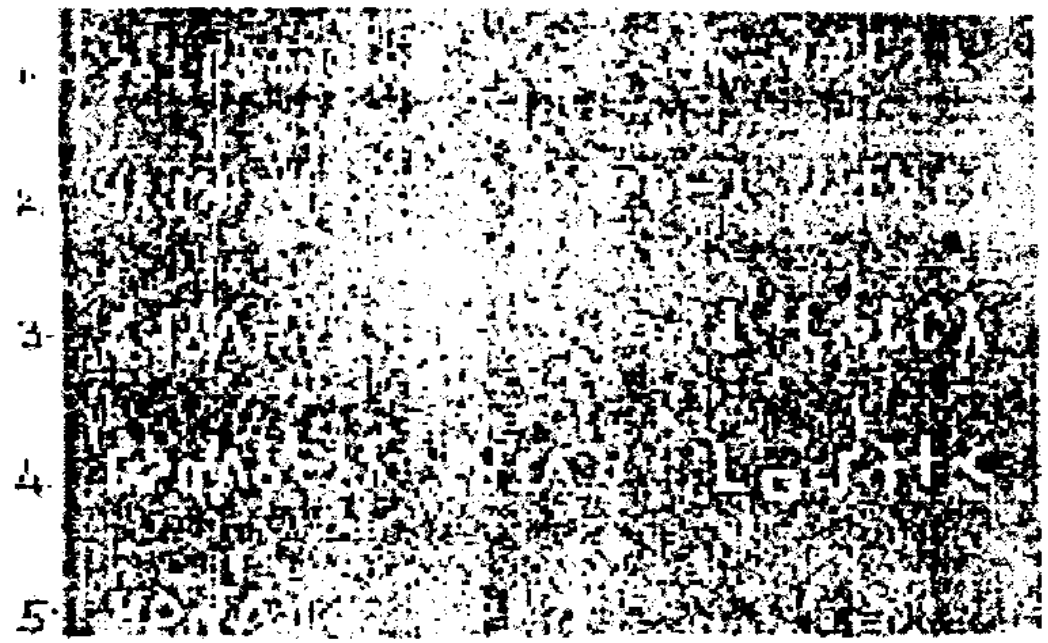

আধুনিক বাংলায় লিপ্যন্তর :-

১ দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজন বিসতি বসাভাসিতেন
২ অতন আগাচ মহীয়িতে হি দাবুধে জাতে সক্যমুনিতি
৩ সিলা বিগড ভীচা কালাপিত সিলা থ ভে চ উস পাপিতে
৪ হিদ ভিগবজা তে লুমিনি গামে উ বলিকে কটে
৫ অঠভাগিয়ে চ

চর্যাগীতি ১-খ পৃষ্ঠা (প্রথম ৪টি চরণের আধুনিক বাংলায় লিপ্যন্তর করা হল)

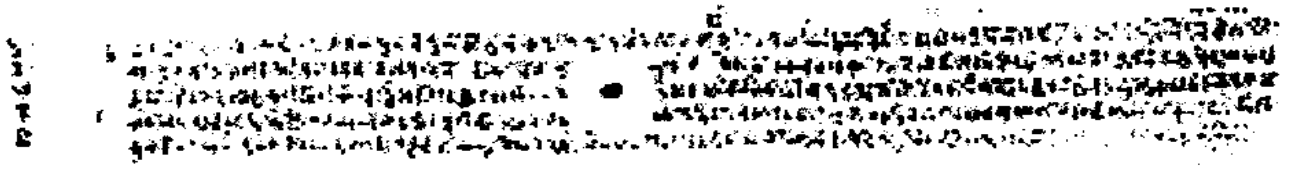

গ্রন্থ ছিদ্র

শ্রী (তোলা পাঠ)

১ নমঃশ্রীবজ্র যোগিন্যৈ ।। শ্রীমদসদুগুরু বক্ত পঙ্কজ স্ফুরধীদয়ো নত্বা কুলিশেসমদ্বধিয়ং শ্রদ্ধা প্রসন্নানন ঃ। শ্রীলূয়ী চরণাদিসিদ্ধ রচিতে প্যা

২ শ্চয্যচয়া (র্যা) চয়ে সদ্বত্মড়া বগমায় নির্মলগিরাং টীকা বিধাস্যে স্ফটং।। ।। কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল। চঞ্চল চীএ পৈঠো কাল।। ধ্রু।। দিঢকরিঅ মহাসু

৩ হ পরিমান। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।। সঅল সমাহিঅ কাহিকরিঅই। সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই।। ধ্রু।। এড়িএউছান্দকবান্দকরনক পাটে

৪ র আস। সুনু পাখ (দেবনাগরীর খ) ভিতি লাহুরে পাস।। ধ্রু।। ভণই লুই আহমেঝানে দিঠা ধমণ চমণ বেনি পাণ্ডি বইণ (ঠা)।। ধ্রু।। রাগ পটমঞ্জরী।। কাআ তরুবরত্যাদি।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ১৩২ সংখ্যক পৃষ্ঠার ২টি চরণের আধুনিক বাংলায় লিপ্যন্তর করা হল—

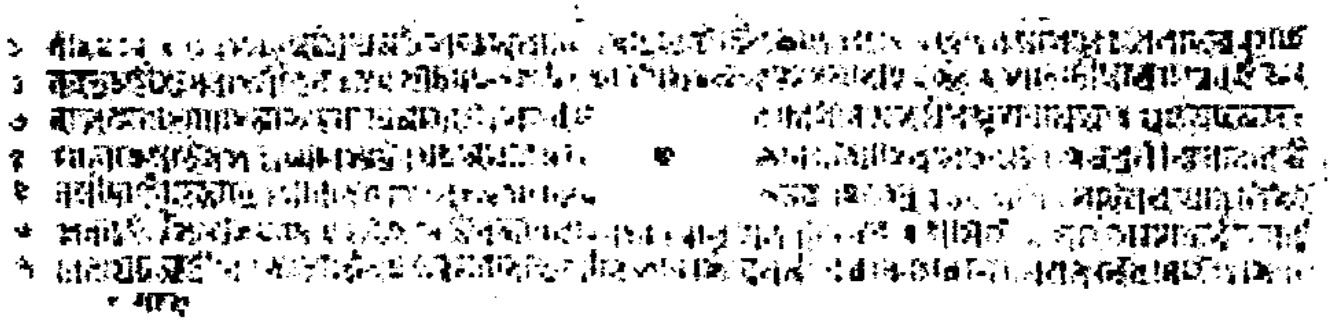

তোলাপাঠ

১ লী দমনে।। ৩।। পাইয়া আনুমতী সন্ধার থানে। দহে ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে।। কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর । গাই

২ ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ।। ৪।। ইতি যমুনর্ন্তগত কালীয় দমন খণ্ড ঃ সমাপতঃ ।। * ।। পাহাড়ীআ রাগ ঃ ।। ক্রীড়া।।

(উক্ত পুথির ২০৪ সংখ্যক পৃষ্ঠার দিকে লক্ষ করলে ডান দিকের মার্জিনে পত্র সংখ্যা চিহ্নের গায়ে 'শ্রীক' লিপিকর লিপি করেছেন। 'শ্রীক' — শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের সংক্ষিপ্ত নামের সংকেত বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ যাঁরা পুথি গবেষক

তাঁরা হয়তো লক্ষ করেছেন বহু পুথির মার্জিনে 'দ্রোণ পর্ব'-'দ্র প' বা 'প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা'-'প / প্রে ভ' ইত্যাদি লিপিকরে লিপিকর গ্রন্থনামের সংকেত দিয়েছেন। এখানে ২০৪ সংখ্যক পৃষ্ঠার ফোটোকপি দেওয়া হল)

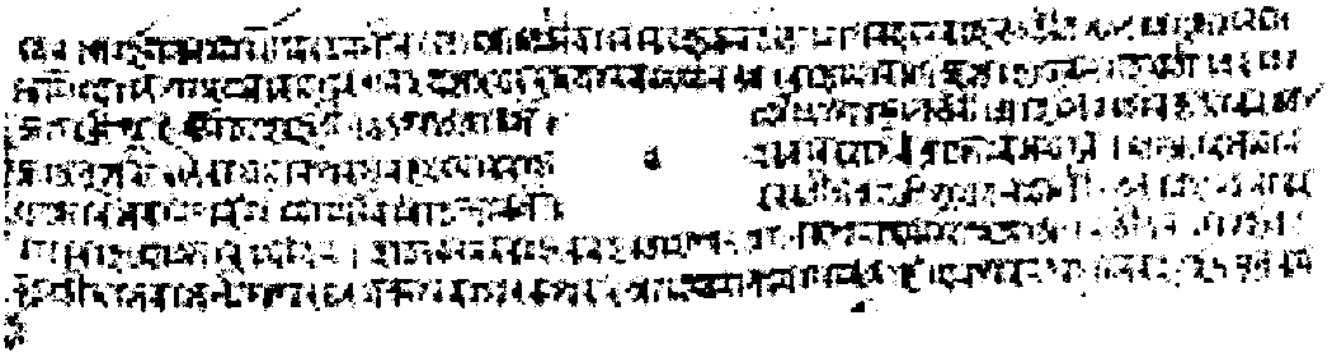

পুথি — আনন্দলতিকা। কবি - লোচনদাস। লিপিকাল — ১০৮০ বঙ্গাব্দ। ১৭ নং পুথি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

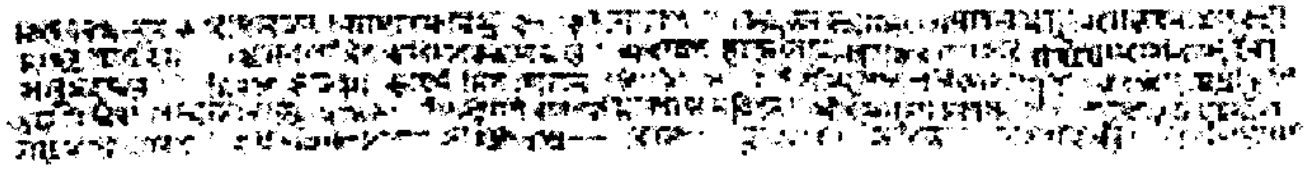

পুথির পুষ্পিকা—ইথে দোশনা লইবা সাধুমহাজন। মিনতি করিঞা কহে এ দিন লোচন।। ইতি শ্রীআনন্দলতিকা সংম্পূর্ন্ন।। *।। *।। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখিকো নাস্তি দোশক।। ভিমষ্যাপি রনে ভঙ্গ মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম। শ্রী শ্রী জাহ্নভা চরণ স্মরণ।। লিখিতং শ্রী জয়কৃষ্ণ দাসানুদাস্য ভাবনা।। ইতি শন ১০৮০ সাল তীঃ ৮ ভাদ্র রোজ রবিবার। মোকামঃ।। বিরসিংহপুর।।

লিপিমালা - চিত্র ১

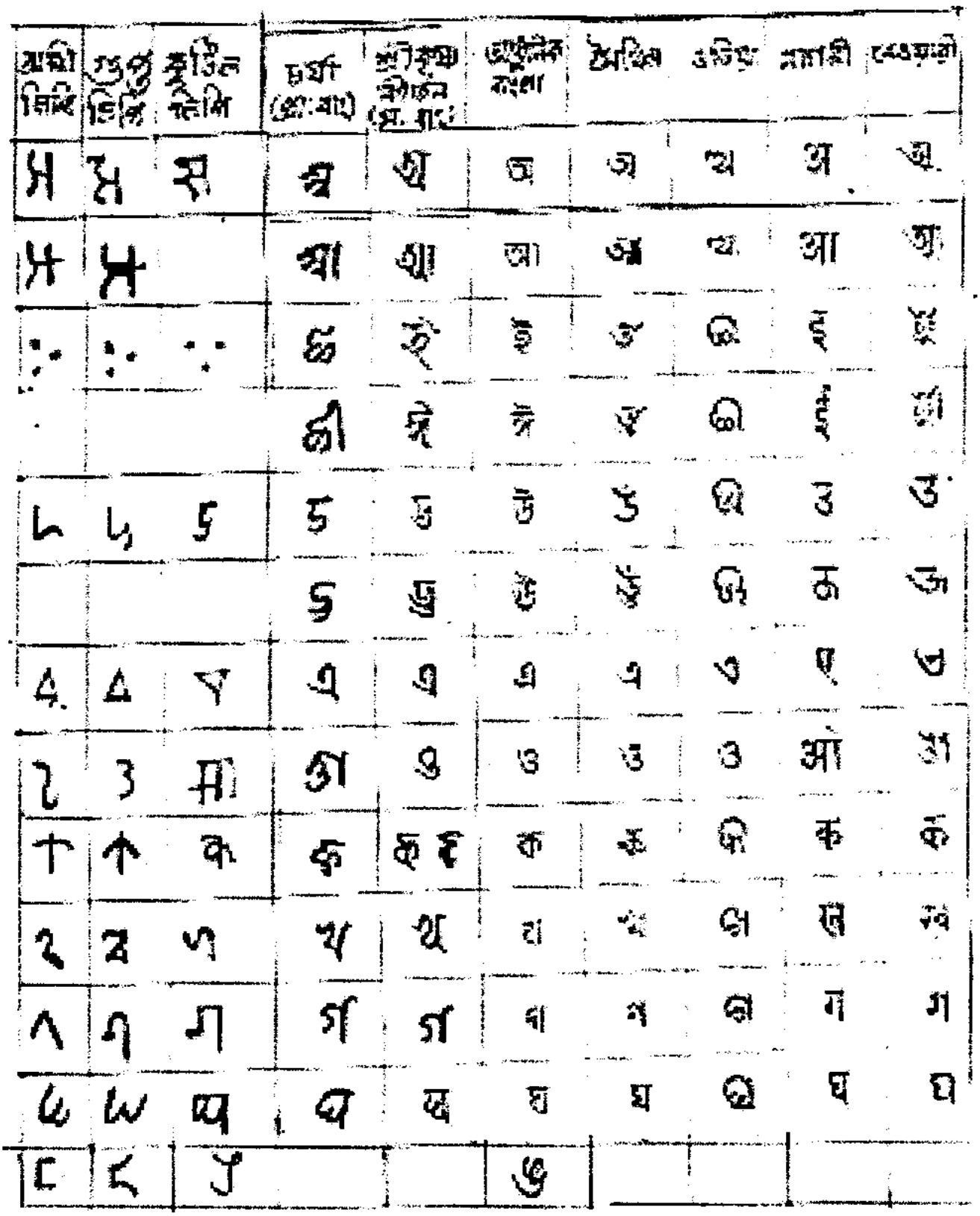

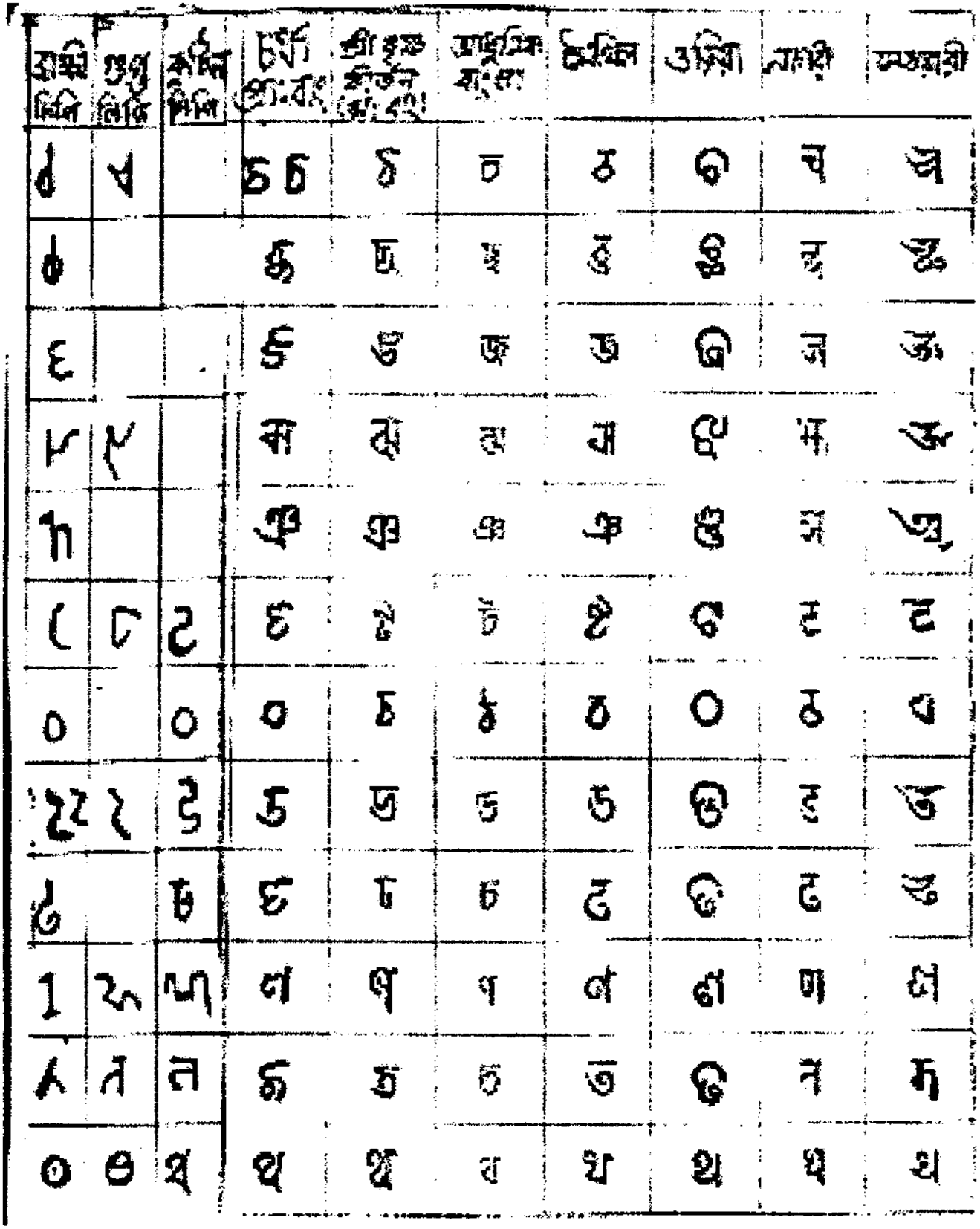

লিপিমালা - চিত্র ২

লিপিমালা - চিত্র ৩

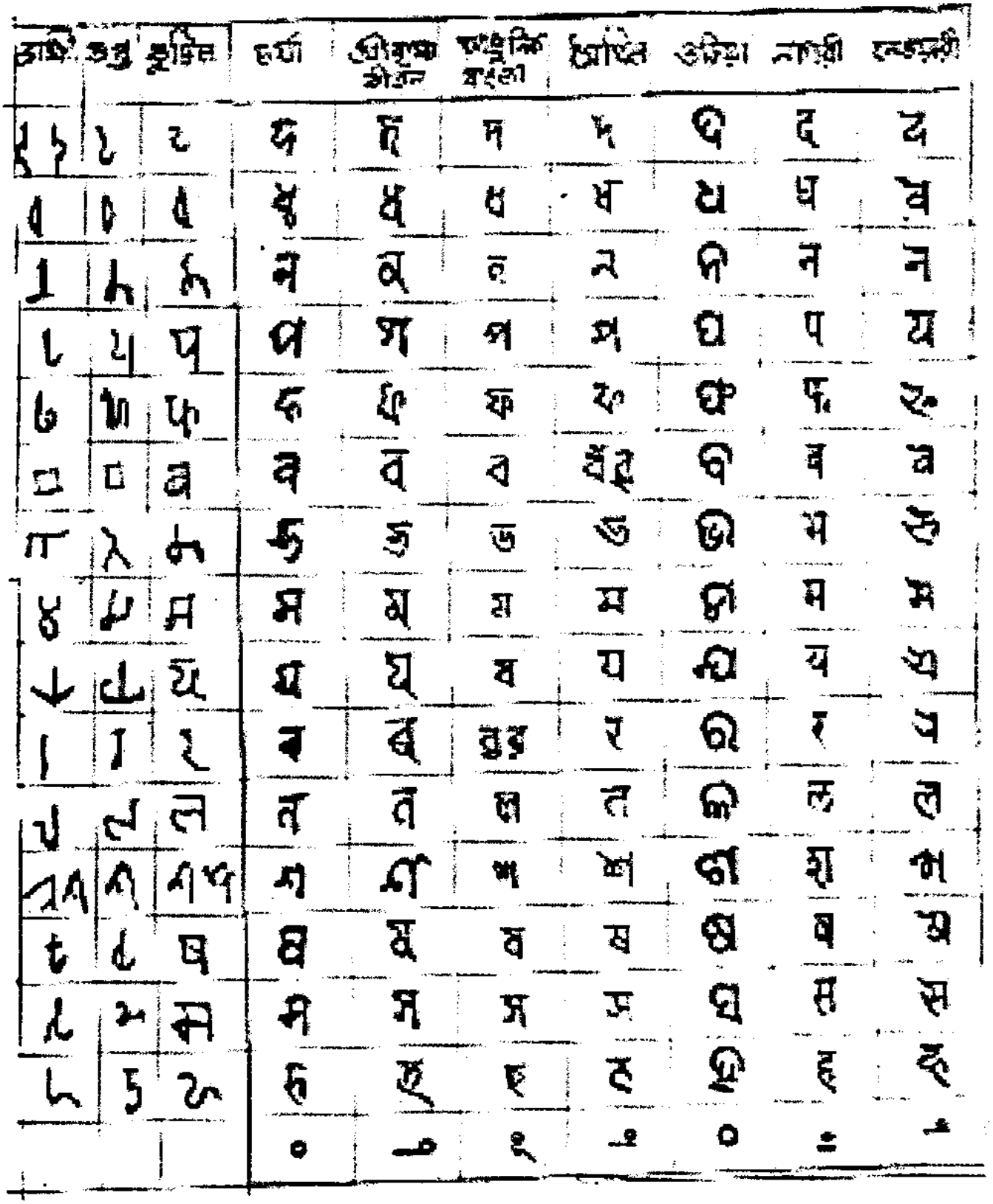

লিপিমালা - চিত্র ৪

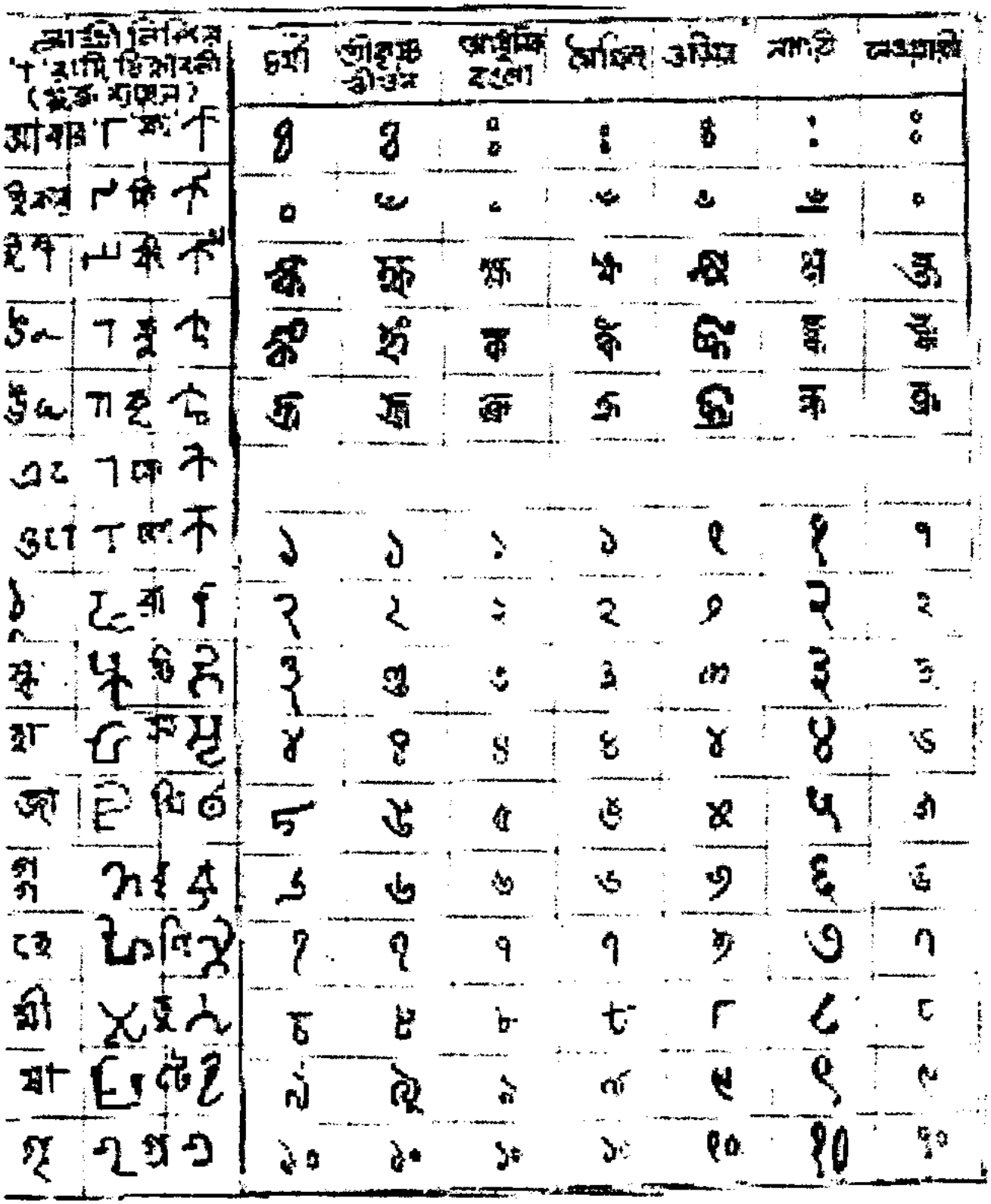

লিপিমালা - চিত্র ৫

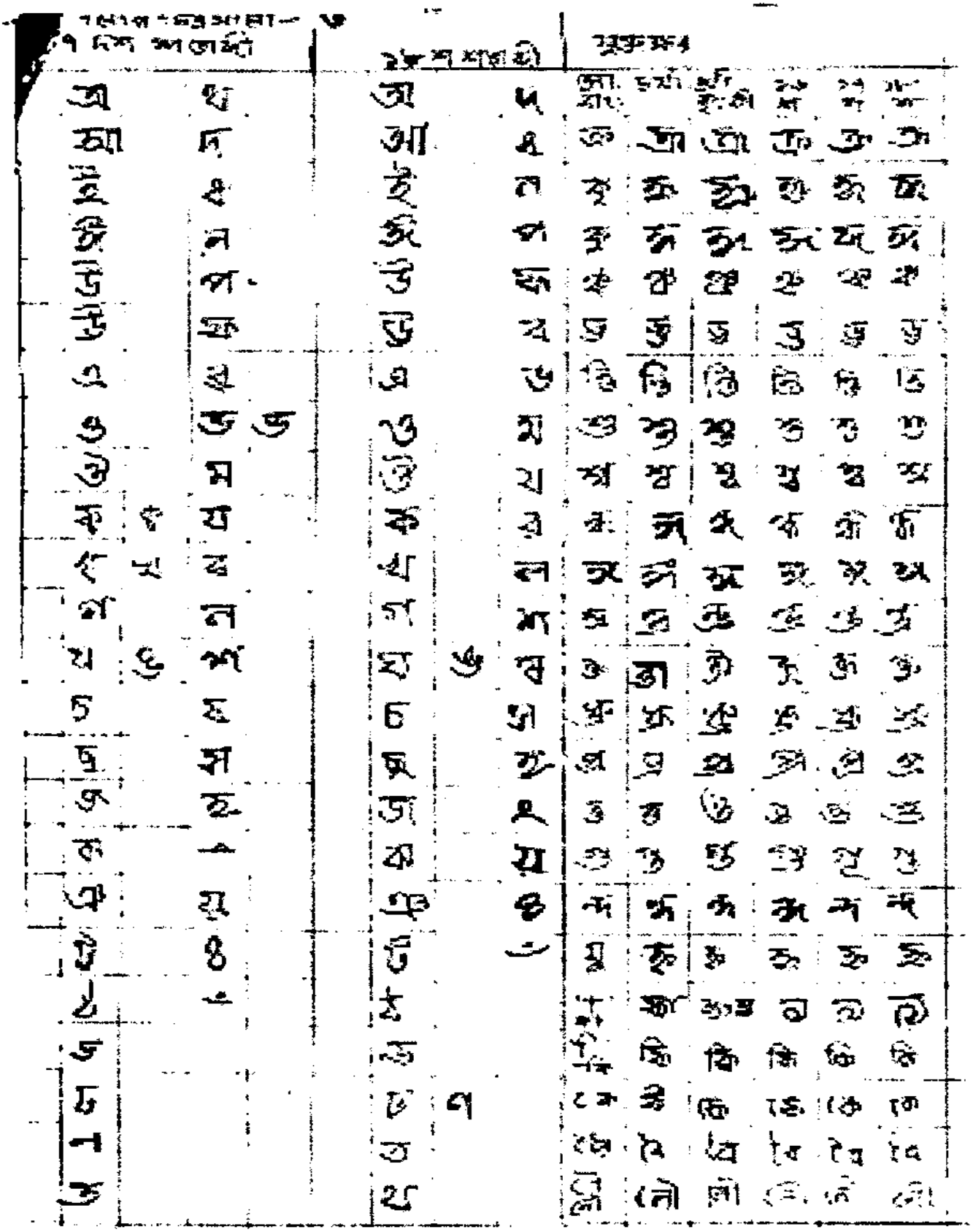

লিপিমালা - চিত্র ৬

উত্তরী ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন — কুষাণযুগ (২০০ খ্রি. পর্যন্ত)
খ্রি. পূ. ৩০০—৭০০ খ্রি. পর্যন্ত

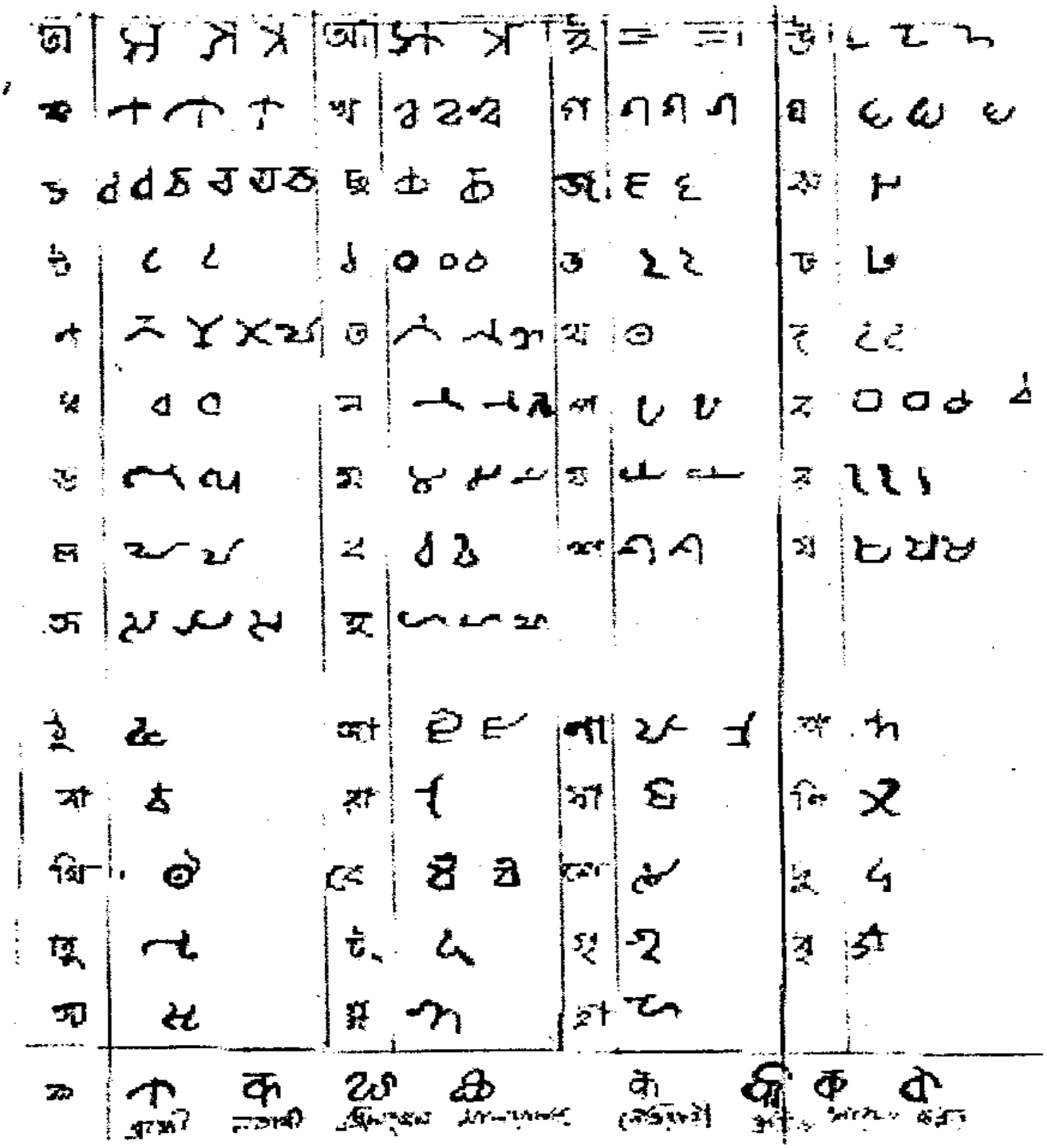

*মনে রাখতে হবে, 'হরফ' নির্মাণ আধুনিক যুগের দান। কাঠ-লোহা-শিসা-তামা দ্বারা নির্মিত কোনো নির্দিষ্ট হরফ সে যুগে ছিল না। হাতের লিপির কোনো স্থায়ী রূপ হয় না।